بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১০ মে, ২০২৪ মোতাবেক ১০ হিজরত, ১৪০৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আজ মহানবী (সা.)-এর যুগের কতিপয় সারিয়্যা তথা সেনাভিযানের উল্লেখ করব। এ সম্পর্কে প্রথমেই বনু আসাদ গোত্রের দুষ্কৃতি এবং আবু সালামার সেনাভিযানের কথা উল্লেখ করা হবে। সারিয়্যা বলা হয় সেই সেনাভিযানকে যাতে মহানবী (সা.) নিজে অংশগ্রহণ করতেন না, কিন্তু তিনি (সা.) অন্যদের অভিযানে প্রেরণ করতেন। এগুলোতেও তাঁর (সা.) সীরত বা জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত হয়। তাঁর (সা.) প্রজ্ঞা ও তিনি কীভাবে মুসলমানদের সুরক্ষা করতেন আর শত্রুদের জন্যও তিনি কীভাবে সহানুভূতি প্রকাশ করতেন– এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি তথা তাঁর জীবনীর এ দিকগুলোর ওপর সেসব সেনাভিযানের মাধ্যমে আলোকপাত হয়।

এই সেনাভিযান চতুর্থ হিজরী সনের মুহাররম মাসে পরিচালিত হয়। এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হযরত আবু সালামা বিন আব্দুল আসাদ মাখযুমি। আবু সালামার নাম ছিল আব্দুল্লাহ্ এবং ডাকনাম ছিল আবু সালামা। তার মায়ের নাম ছিল বাররাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালিব। তিনি মহানবী (সা.)-এর ফুপাতো ভাই এবং হযরত হামযা (রা.)-র দুধভাইও ছিলেন। তিনি আবু লাহাবের দাসী সোয়াইবার দুধ পান করেছিলেন। হযরত উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামার বিয়ে পূর্বে তার সাথেই হয়েছিল। হযরত আবু সালামা বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি উহুদের যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন। এক মাস পর্যন্ত সেই ক্ষতস্থানের চিকিৎসা করান। বাহ্যত সে ক্ষত সেরে গিয়েছিল আর তা এমনভাবে সেরে গিয়েছিল যে, কোনো ক্ষত আছে কিনা তা বুঝাই যেতো না। এ অভিযানের পটভূমি কিছুটা এরূপ যে, মদীনায় বসবাসরত মুনাফিক ও ইহুদিরা উহুদের যুদ্ধ পরবর্তী অবস্থা ও ঘটনাবলির কারণে আনন্দ উদযাপন আরম্ভ করে আর পুনরায় তাদের হৃদয়ে এই ধারণার উদয় হতে থাকে যে, মুসলমানদের দ্রুত ধ্বংস করার জন্য পরিকল্পনা করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে মদীনার আশেপাশে বসবাসকারী যেসব গোত্র বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের মহান বিজয়ের কারণে ভীত হয়ে পড়েছিল, তাদের মনেও এ ধারণা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে যে, উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তাই মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে তাদের ক্ষয়ক্ষতি সাধন আর লুটতরাজ করে তাদের ধন-সম্পদ দখল করার এখনই সুযোগ। অতএব উহুদের যুদ্ধের কেবল দুই মাস অতিক্রান্ত হতেই সেসব গোত্র থেকে যে গোত্রটি সর্বপ্রথম মুসলমানদের ওপর আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিল সেটি ছিল বনু আসাদ বিন খুযায়মা। তারা নাজাদ-এর অধিবাসী ছিল। এ গোত্রের নেতা তুলায়হা বিন খুয়াইলিদ ও তার ভাই সালামা বিন খুয়াইলিদ লোকদের একত্রিত করে একটি সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে ফেলে। বনু আসাদ-এর একজন ব্যক্তি কায়েস বিন হারেছ বিন উমায়ের নিজ জাতির লোকদের মুসলমানদের ওপর আক্রমণ না করার পরামর্শ প্রদান করে বলে, হে আমার জাতির লোকেরা! এটি বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। মুসলমানদের পক্ষ থেকে আমরা কোনো ধরনের ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন নই, মুসলমানরা

আমাদের কোনো ক্ষতি করছে না। আর তারা আমাদের ওপর লুটতরাজের উদ্দেশ্যে আক্রমণও করে নি। আমাদের অঞ্চল ইয়াসরেব অর্থাৎ মদীনা থেকে দূরে (অবস্থিত)। কুরাইশদের ন্যায় সেনাবাহিনীও আমাদের নেই। স্বয়ং কুরাইশরা এক দীর্ঘকাল থেকে আরবদের নিকট তাদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) বিরুদ্ধে সাহায্য চেয়ে আসছে। তারা তো তাদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) বিরুদ্ধে প্রতিশোধও নিতে চাইছিল। এরপর তারা উটে আরোহণ করে ঘোড়ার লাগাম সামলে বের হয়েছিল। তারা তিন হাজার যোদ্ধা এবং নিজেদের অনুসারীদের একটি বড় সংখ্যা সাথে নিয়ে গিয়েছিল। অনেক অস্ত্রশস্ত্রও (সাথে) নিয়েছিল। এর বিপরীতে তোমাদের ক্ষমতাই বা কতটুকু? তোমারা সর্বোচ্চ তিনশ' ব্যক্তিকে নিয়ে বের হবে। এটি তোমাদের জন্য এক চরম আত্মপ্রবঞ্চনা হবে। নিজেদের এলাকা থেকে দূরে চলে যাবে। আর আমার শঙ্কা হলো, তোমরা বিপদে নিপতিত হবে। কিন্তু তারা কায়েসের পরামর্শ শোনে নি। অপরদিকে বনু আসাদ গোত্রের মদীনা মুনাওয়ারার ওপর আক্রমণ করার পরিকল্পনার সংবাদ মহানবী (সা.)-এর কাছে এভাবে পৌঁছে যায় যে, 'ত্যায়' গোত্রের এক ব্যক্তি ওয়ালীদ বিন যুহায়ের মদীনায় আসে। সে তার ভাতিজি যয়নবের সাথে সাক্ষাতের জন্য এসেছিল, যে তুলায়েব বিন উমায়ের বিন ওহাব-এর স্ত্রী ছিল। সে বনু আসাদ গোত্রের উপরোল্লিখিত পরিকল্পনার সংবাদ প্রদান করলে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, বনু আসাদ গোত্র মদীনায় আক্রমণ করার পূর্বেই স্বয়ং মুসলমানরা নিজেদের সুরক্ষার্থে তাদের এলাকায় আক্রমণ করুক। অতএব তিনি (সা.) হযরত আবু সালামা বিন আব্দুল আসাদকে ডেকে পাঠান আর তাকে নির্দেশ দেন, এই অভিযানে রওয়ানা হয়ে যাও। আমি তোমাকে এর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছি। এরপর তিনি (সা.) তার জন্য পতাকা বাঁধেন। আর এই নির্দেশনা দেন যে, বনু আসাদ-এর এলাকা পর্যন্ত তোমাদের সফর অব্যাহত রাখো, তাদের বাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হওয়ার পূর্বেই সেখানে পৌঁছে তাদের ওপর আক্রমণ করো। ১৫০জন সাহাবীর সমন্বয়ে গঠিত বাহিনী আবু সালামার নেতৃত্বে এসব গোত্রকে দমন করার জন্য রওয়ানা হয়। ত্যায় গোত্রের সেই ব্যক্তি, অর্থাৎ ওয়ালীদ বিন যুহায়ের গাইড বা পথপ্রদর্শক হিসেবে তাদের সাথে ছিল। এই অভিযানে অংশগ্রহণকারী কতিপয় সাহাবীর নাম হলো– আবু সাবরা বিন আবি রুহম, আব্দুল্লাহ্ বিন সুহায়েল বিন আমর, আব্দুল্লাহ্ বিন মাকরামা আমরী, মুআত্তেব বিন ফযল, আরকাম বিন আবি আরকাম, আবু উবায়দা বিন জাররাহ, সুহায়েল বিন বায়যা, উসায়েদ বিন হুযায়ের আনসারী, আব্বাদ বিন বিশর আনসারী, আবু নায়লা আনসারী, আবু আবস কাতাদা বিন নোমান, নযর বিন হারেস, আবু কাতাদা আনসারী, আবু আইয়াশ যুরাকী, আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ আনসারী, খুবায়েব বিন ইয়াসাফ, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, আবু হুযায়ফা বিন উতবা, আবু হুযায়ফার ক্রীতদাস সালেম।

সাহাবীরা নিজেদের এই অভিযান গোপন রেখে দ্রুতবেগে সাধারণ পথ থেকে সরে গিয়ে অগ্রসর হন যেন দ্রুততম সময়ে শত্রুদের কাছে পৌঁছতে পারেন। তারা রাতদিন অনবরত এই সফর করেন। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে দিনের একটি অংশ তারা লুকিয়ে থাকতেন আর রাতে সফর করতেন। এভাবে চারদিন সফরের পর তারা কাতান পাহাড়ের নিকটে পৌঁছে যান। কাতান সম্পর্কে লেখা আছে, এটি ফ্যেদ-এর নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের নাম। আর ফ্যেদ, কুফার পথে একটি বিরতিস্থলের নাম যেখানে বনু আসাদ বিন খুযায়মা-র ঝরনা ছিল। মুসলমানরা সেখানে পৌঁছতেই আক্রমণ করে তাদের গবাদিপশু দখল করে নেয়। তাদের রাখালদের মধ্য থেকে তিনজনকে বন্দি করে আর বাকিরা পালিয়ে যেতে সক্ষম

হয়। এই পলায়নকারীরা বনু আসাদ-এর বসতিস্থলে পৌঁছে মুসলমান বাহিনীর আগমন এবং তাদের আক্রমণের সংবাদ দেয় আর আবু সালামার বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা অনেক বাড়িয়ে বলে। অর্থাৎ এই রাখালরাও অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেয় যে, অনেক বড় বাহিনী এসেছে। ফলে তাদের মাঝে আরও ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। বনু আসাদ গোত্র ভীত-ত্রস্ত হয়ে পড়ে। আর মুসলমানদের হঠাৎ পৌঁছে যাওয়ার কারণে এমন ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে যে, তারা ভয়ে এদিক-সেদিক পালিয়ে যায়। হযরত আবু সালামা যখন বনু আসাদ গোত্রের শিবিরে পৌঁছেন আর দেখেন যে, শত্রুরা পালিয়ে গেছে; তখন তিনি তাদের সন্ধানে নিজ সঙ্গীদের প্রেরণ করেন। হযরত আবু সালামা তাদেরকে তিনটি অংশে বিভক্ত করেন। একটি অংশ তার সাথে অবস্থান করে। অপর দুই অংশকে তিনি দুটি ভিন্ন দিকে প্রেরণ করেন। আর একইসাথে এই নির্দেশনাও প্রদান করেন যে, শত্রুদের পিছু ধাওয়ায় বেশি দূরে যাবে না। আর যদি শত্রুদের সাথে সংঘর্ষ না হয় তাহলে ফিরে এসে তারা যেন রাতে তার কাছেই অবস্থান করে। আর এই জোরালো নির্দেশও দেন যে, বিক্ষিপ্ত হবে না, একসাথে থাকবে। কিন্তু শত্রুরা হতবিহ্বল হয়ে এত দ্রুত পলায়ন করেছিল যে, কারো সাথেই মুসলমানদের মোকাবিলা হয় নি। হযরত আবু সালামা সমস্ত গনিমতের মালসহ মদীনার ফিরতি সফর আরম্ভ করেন। যে ব্যক্তি পথপ্রদর্শক হিসেবে সাথে গিয়েছিল সে তাদের সাথেই ফিরে আসে। এক রাতের সফর করার পর হযরত আবু সালামা গনিমতের সম্পদ ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর জন্য খুম্‌স্ তথা এক পঞ্চমাংশ পৃথক করে রাখেন। পথ-প্রদর্শককে তার পছন্দ অনুসারে সম্পদ দান করেন আর অবশিষ্ট গনিমতের মাল সাহাবীদের মাঝে বণ্টন করে দেন। প্রত্যেক সাহাবীর ভাগে সাতটি উট এবং বেশ কয়েকটি ছাগল পড়ে। আর এভাবেই তারা তাদের অবশিষ্ট পথ পাড়ি দিয়ে প্রায় দশ দিন পরে উৎফুল্ল ও আনন্দিত অবস্থায় মদীনায় পৌঁছেন।

হযরত আবু সালমা (রা.)-র বরাতে আমি যে উদ্ধৃতি দিয়েছি তা বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। সীরাত খাতামান্ নবীঈন (পুস্তকের)ও কিয়দংশ এতে অন্তর্ভুক্ত আছে। যাহোক, হযরত আবু সালামা (রা.)-র মৃত্যু সম্পর্কে লেখা আছে, হযরত আবু সালমা (রা.) এই সারিয়্যা বা সেনাভিযানের জন্য দশ রাতের চেয়ে কিছু অধিক সময় মদীনার বাইরে ছিলেন। মদীনায় ফিরে আসার পর তিনি উহুদের যুদ্ধে যে আঘাত পেয়েছিলেন তাতে ইনফেকশান দেখা দেয়, যে কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন আর সেই বছরই ৩রা জমাদিউল আখেরে তিনি পরলোক গমন করেন। বনু আসাদের নেতা তুলায়হা বিন খুওয়াইলিদের উল্লেখ করা হয়েছে; সে অত্যন্ত সাহসী মানুষ ছিল। প্রসিদ্ধ আছে, আরবদেশে তাকে এক হাজার অভিজ্ঞ অশ্বারোহীর সমান মনে করা হতো। আর সে খুবই বাগ্মী ছিল। নবম হিজরীতে বনু আসাদের (একটি) প্রতিনিধি-দলের সাথে সে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু পরবর্তীতে সে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এবং মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই মিথ্যা নবুয়্যতের দাবি করে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার কারণ হয়, আর পরিশেষে পরাজিত হয়ে আরব থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। পুনরায় কিছুকাল পরে মদীনায় এসে হযরত উমর (রা.)-র হাতে বয়আত করে এবং আমৃত্যু ইসলামে অবিচল থাকেন। কাদসিয়ার যুদ্ধ এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি ইসলামি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নিজের বীরত্বের স্বাক্ষর রাখে এবং ২১ হিজরীতে একটি যুদ্ধে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করে। আল্লাহ্ তা'লা তার পরিণতি শুভ করতে চেয়েছেন, তাই অবশেষে সে ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করে।

এরপর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উনায়েসের সেনাভিযানের উল্লেখ রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উনায়েস জুহনী (রা.) আনসারের মধ্য হতে বনু সালামার মিত্র ছিলেন। তিনি

আকাবার দ্বিতীয় বয়আত, বদর, উহুদসহ অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা বনু সালামার প্রতিমা ভেঙেছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উনায়েস (রা.) ৫৪ হিজরীতে অথবা কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুসারে ৭৪ হিজরীতে সিরিয়ায় মৃত্যু বরণ করেন। উহুদের যুদ্ধের ঘটনাবলি যখন মদীনার আশেপাশের গোত্রের লোকেরা জানতে পারে তখন যারা মুসলমানদের দুর্বল মনে করে তাদের ওপর আক্রমণ করার ষড়যন্ত্র করছিল তাদের মধ্যে বনু লিহইয়ান গোত্রের নেতা খালিদ বিন সুফিয়ান হুযলী লিহইয়ানীও ছিল। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে তার নাম সুফিয়ান বিন খালিদও উল্লেখ করা হয়েছে। যাহোক, সে ভাবে, সদ্য উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তাই তাদের এই দুর্বলতার সুযোগে তাদের ওপর আক্রমণ রচনা করে আর মদীনায় লুটপাট চালিয়ে তাদের ক্ষেত্রে নিজেদের প্রভাব বলয় বিস্তৃত করা উচিত। তার হৃদয়ে ইসলামের প্রতি ভয়াবহ শত্রুতা ছিল আর (সে) চরম অহংকারী ছিল। সে নাখলা অথবা আরাফাতের নিকটবর্তী উরনা উপত্যকায় সেনাদল প্রস্তুত করছিল। সে তার গোত্রের যুদ্ধবাজ ও আশেপাশের লোকদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সমবেত করার অভিযান পরিচালনা করছিল আর ইতঃমধ্যে বিভিন্ন গোত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত অনেক মানুষ তার সাথে জড়োও হয়ে গিয়েছিল। মহানবী (সা.) যখন জানতে পারেন যে, সুফিয়ান বিন খালিদ মদীনায় আক্রমণ করার জন্য এক সেনাদল সমবেত করেছে, তখন তিনি (সা.) একটি অনন্য প্রজ্ঞাপূর্ণ সামরিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অর্থাৎ সেনাদল গঠন করে সুফিয়ানের মোকাবিলার জন্য প্রেরণ করলে উভয় পক্ষের রক্তপাত ঘটবে; তাই প্রজ্ঞার সাথে এই বিদ্রোহী সেনাদল গঠনের মূল হোতাকে হত্যা করাই বাঞ্ছনীয়। অতএব, মহানবী (সা.) এই বিপজ্জনক অথচ গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য নিজের একজন সাহসী সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উনায়েসকে বেছে নেন। মহানবী (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উনায়েস (রা.)-কে ডেকে সুফিয়ান বিন খালিদের সকল ষড়যন্ত্রের কথা খুলে বলেন এবং বলেন, **'চুপিসারে গিয়ে তাকে হত্যা করো'**। আব্দুল্লাহ্ (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! তার অবয়ব সম্পর্কে আমাকে বলুন। তিনি (সা.) বলেন, তাকে তুমি দেখামাত্রই চিনতে পারবে আর তাকে দেখলেই সাক্ষাৎ শয়তান বলে মনে হবে। আব্দুল্লাহ্ (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি কখনো কাউকে ভয় করি নি। তিনি (সা.) বলেন, সত্য বলেছ, কিন্তু তাকে দেখে তোমার (শরীরের) লোম দাঁড়িয়ে যাবে। অতএব, তিনি একাই ৪র্থ হিজরীর ৫ই মুহাররম তারিখে এই অভিযানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। আব্দুল্লাহ্ (রা.) বলেন, আমি যখন আরাফতের নিকটবর্তী উপত্যকা উরানায় পৌঁছি তখন আমি সুফিয়ানকে লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটতে দেখি আর তার পেছনে বিভিন্ন গোত্রের ঐসব লোক ছিল যারা তার সাথে যোগ দিয়েছিল। সে বার্ধক্যের কারণে লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটছিল না, বরং সেই যুগের রীতি অনুযায়ী হাতে লাঠি রাখত। যাহোক, আব্দুল্লাহ্ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) তার যেসব লক্ষণ বর্ণনা করেছিলেন তা দেখে আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে চিনতে পারি। কেননা, তাকে দেখামাত্রই আমার ওপর ভীতি ছেয়ে যায়, যদিও আমি কখনো কাউকে ভয় পেতাম না। কাজেই, আমি মনে মনে বলি, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.) সত্য বলেছিলেন। তখন সময়টি ছিল আসরের নামাযের। আমার আশঙ্কা হয়, এখনই যদি আমি তার মুখোমুখি হই তাহলে আবার আমার আসরের নামায না ছুটে যায়! তাই আমি তার উদ্দেশ্যে হাঁটতে হাঁটতে ইশারায় নামায পড়ে নিই। আমি তার কাছে পৌঁছলে সে জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? আমি উত্তরে বলি, আমি বনু খুযাআ গোত্রের সদস্য। আমি শুনেছি, তুমি মুহাম্মদ (সা.)-এর মোকাবিলা করার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করছ; আমিও তোমার সাথে

যোগ দিতে এসেছি। সে বলে, (হ্যাঁ,) নিঃসন্দেহে আমি মুহাম্মদকে মোকাবিলা করার জন্য সেনাসংগ্রহ করছি। অতএব, আমি কিছুক্ষণ তার সাথে হাঁটতে থাকি। এরপর আমি তার সাথে কথা বলতে আরম্ভ করলে সে আমার কথায় গভীর আগ্রহ দেখায়। সুফিয়ান বিন খালিদ বলে, আসলে এখন পর্যন্ত মুহাম্মদ (সা.) আমার মতো কারও মুখোমুখি হয় নি! এখন পর্যন্ত কেবল এমন লোকদের সাথেই (তাঁর) যুদ্ধ হয়েছে যারা যুদ্ধে অনভিজ্ঞ। অবশেষে সে যখন তার তাঁবুতে পৌঁছে এবং তার সঙ্গীরা চলে যায় তখন সে আমাকে বলে, হে খুযায়ী ভাই! একটু এদিকে আসো। আমি তার কাছে গেলে সে বলে, বসো; আমি তার কাছেই বসে পড়ি। রাতের নিস্তব্ধতা যখন ছেয়ে যায় এবং লোকজন ঘুমিয়ে পড়ে তখন আমি অকস্মাৎ উঠে তাকে হত্যা করে তার মস্তক হাতে নিই। আমি সেখান থেকে বের হয়ে নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিই। কিছু লোক খুঁজতে খুঁজতে সেই গুহা পর্যন্ত আসলেও তারা কিছুই (খুঁজে) না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যায়। এরপর আমি গুহা থেকে বের হয়ে রওয়ানা হই। আমি রাতের বেলা সফর করতাম (আর) দিনে কোথাও লুকিয়ে থাকতাম, অবশেষে মদীনায় পৌঁছলে আমাকে দেখামাত্রই মহানবী (সা.) অবলীলায় বলেন, اَفْلَحَ الْوَجْهُ অর্থাৎ, এই চেহারা সফল হয়েছে। লক্ষ্য করে দেখুন! তিনি তৎক্ষণাৎ পরম বুদ্ধিমত্তা ও বিনয়ের সাথে মহানবী (সা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, اَفْلَحَ وَجْهُكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ অর্থাৎ, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার চেহারা সফল হয়েছে। অর্থাৎ এসব সফলতা আপনারই, আপনার দোয়ার কল্যাণেই (একাজ সম্ভব) হয়েছে। এরপর হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) পুরো ঘটনা বর্ণনা করে সেই বিদ্রোহী নেতার (কর্তিত) মস্তক মহানবী (সা.)-এর সামনে রাখেন।

(এ সম্পর্কে) একটি রেওয়াতে এমনও আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উনায়েস (রা.)-র ফিরে আসার পূর্বেই মহানবী (সা.) সুফিয়ান বিন খালিদের মৃত্যুসংবাদ দিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, এই সফলতায় আনন্দিত হয়ে তিনি (সা.) আমাকে একটি লাঠি উপহার দিয়ে বলেন, 'জান্নাতে এটি আমার ও তোমার মাঝে (একটি স্মারক) চিহ্ন হবে। তুমি জান্নাতে এই লাঠিতে হেলান দিয়ে দাঁড়াবে। অতএব, এরপর থেকে আমৃত্যু সেই লাঠিটি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উনায়েস (রা.)-র কাছেই ছিল। এমনকি তিনি যখন অন্তিম শয্যায় তখন তিনি নিজ পরিবারের সদস্যদেরকে এ সম্পর্কে ওসিয়্যত করে বলেন, এই লাঠি আমার কাফনের মধ্যে এমনভাবে রাখবে যেন তা আমার শরীর ও কাফনের মাঝে থাকে। অতএব পরিবারের সদস্যরা তাঁর নির্দেশ অনুসারে কাজ করে। আব্দুল্লাহ্ বিন উনায়েসকে যুল-মিখসারা তথা লাঠিওয়ালাও বলা হয়। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উনায়েস ১৮দিন মদীনার বাইরে অবস্থান করেন আর মুহাররমের সাত দিন বাকি থাকতে শনিবার (মদীনায়) প্রত্যাবর্তন করেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ. (রা.) ০৪হিজরীর মুহাররমে সংঘটিত এই অভিযানের বিস্তারিত উল্লেখ করতে গিয়ে লেখেন:

কুরাইশের উসকানি এবং উহুদে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় খুব দ্রুত বিপজ্জনক ফলাফল প্রকাশ করছিল। যেমন, সেদিনগুলোতে বনু আসাদ মদীনায় আকস্মিক চোরাগোপ্তা হামলার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। মহানবী (সা.) জানতে পারলেন, বনু লিহইয়ান গোত্রের লোকেরা তাদের নেতা সুফিয়ান বিন খালিদের উসকানিতে তাদের মাতৃভূমি 'উরানাহ'-এ বৃহৎ সেনাসমাবেশ করছে যেটি মক্কার নিকটবর্তী একটি স্থান ছিল আর তারা মদীনার ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত। মহানবী (সা.) ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং আরবের বিভিন্ন গোত্রের

অবস্থা এবং তাদের নেতাদের শক্তিমত্তা ও প্রভাবের বিষয়ে ভালোভাবে অবগত ছিলেন; এই সংবাদ শোনামাত্র বুঝতে পেরেছেন যে, এই সকল দুষ্কৃতি ও নৈরাজ্য সৃষ্টির হোতা বনু লিহইয়ানের নেতা সুফিয়ান বিন খালিদ। সে না থাকলে বনু লিহইয়ান মদীনায় আক্রমণ করার সাহস করবে না। তিনি (সা.) এটিও জানতেন যে, সুফিয়ান ছাড়া এই গোত্রে বর্তমানে এ ধরনের দুষ্কৃতিমূলক কর্মে নেতৃত্ব দিতে পারে– এমন কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি নেই। অতএব বনু লিহইয়ানের বিরুদ্ধে কোনো সেনাদল পাঠালে দুর্বল মুসলমানদের জন্য কষ্টের কারণ তো হবেই উপরন্তু এতে আরো অধিক রক্তপাতের কারণ হতে পারে– একথা ভেবে তিনি (সা.) সিদ্ধান্ত দিলেন যে, কোনো এক ব্যক্তি সেখানে গিয়ে সুযোগ বুঝে এই নৈরাজ্যের হোতা এবং দুষ্কৃতির জন্য দায়ী সুফিয়ান বিন খালিদকে হত্যা করা উচিত। অতএব এ উদ্দেশ্যে তিনি (সা.) আব্দুল্লাহ্ বিন উনায়েস আল-জুহানী আনসারীকে প্রেরণ করেন। যেহেতু আব্দুল্লাহ্ (রা.) পূর্বে কখনো সুফিয়ানকে দেখেন নি তাই তিনি (সা.) স্বয়ং তাকে সুফিয়ানের পূর্ণ অবয়ব ইত্যাদি বিষয়ে অবগত করেন এবং শেষে বলেন, সাবধান থাকবে কেননা সুফিয়ান এক মূর্তিমান শয়তান। অতএব আব্দুল্লাহ্ বিন উনায়েস খুব সাবধানতার সাথে বনু লিহইয়ানের শিবিরে পৌঁছে দেখেন, সত্যিই তারা পূর্ণ উদ্যমে মদীনায় আক্রমণের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। এই রাতের আঁধারেই সুযোগ বুঝে তিনি (রা.) সুফিয়ানের ভবলীলা সাঙ্গ করে দিলেন। বনু লিহইয়ান এই সংবাদ জানতেই আব্দুল্লাহ্ (রা.)-র পিছু ধাওয়া করে কিন্তু তিনি (রা.) লুকিয়ে প্রাণে বেঁচে ফেরেন। আব্দুল্লাহ্ বিন উনায়েস মহানবী (সা.)-এর সমীপে এসে উপস্থিত হলে তিনি (সা.) তার চেহারা দেখেই বুঝে যান যে, তিনি কার্যসিদ্ধি করে এসেছেন। অতএব তাকে দেখে তিনি (সা.) বলে ওঠেন, 'আফলাহাল ওয়াজহু'; এই চেহারায় তো সফলতার প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে। প্রত্যুত্তরে আব্দুল্লাহ্ (রা.) নিবেদন করেন এবং অতি প্রশংসনীয় বাক্যে বলেন, 'আফলাহা ওয়াজহুকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্' অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌র রসূল! সফলতা আসলে আপনার-ই। তখন মহানবী (সা.) নিজ হাতের লাঠি আব্দুল্লাহ্‌কে পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করেন এবং বলেন, এই লাঠি জান্নাতে তোমার ভর দেওয়ার কাজে আসবে। আব্দুল্লাহ্ (রা.) এই বরকতময় লাঠি অতি সাদরে ও আন্তরিকতার সাথে নিজের কাছে সংরক্ষণ করেন আর মৃত্যুকালে ওসিয়্যত করেন যে, এটিকে তাঁর সাথেই যেন দাফন করা হয়। অতএব উক্ত ওসিয়্যত বাস্তবায়ন করা হয়। আব্দুল্লাহ্ (রা.)-র সফল প্রত্যাবর্তনে মহানবী (সা.) পরম আনন্দিত ছিলেন যার বহিঃপ্রকাশস্বরূপ তিনি (সা.) তাকে অসাধারণ পুরস্কারে ভূষিত করেন। যা থেকে বুঝা যায় যে, সুফিয়ান বিন খালিদের নৈরাজ্যকে মহানবী (সা.) চরম বিপজ্জনক জ্ঞান করতেন এবং তার মৃত্যুকে সর্বজনীন নিরাপত্তার জন্য রহমতের কারণ মনে করতেন।

ইসলামের বিরোধী শত্রুরা মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে আপত্তি করে বলে, নাউযুবিল্লাহ্ তিনি (সা.) নাকি শান্তি বিনষ্ট করেছেন এবং মানুষ খুন করিয়েছেন। অথচ মানবজীবনের প্রতি সম্মানের কারণেই তিনি শত্রুগোত্রীয় লোকদের প্রাণ রক্ষার্থে এ কৌশল অবলম্বন করলেন। অর্থাৎ গণমানুষের প্রাণ রক্ষার্থে একজনকে হত্যা করা শ্রেয়। এটি মানবতার প্রতি সহানুভূতির পরম মার্গ। বর্তমান কালের তথাকথিত সভ্য পৃথিবী কিছু লোককে হত্যার অজুহাতে নিষ্পাপ শিশু-নারী-বৃদ্ধদের হত্যা করছে আর নির্লজ্জতার সাথে বলছে, যুদ্ধে তো এরূপ হয়েই থাকে। মহানবী (সা.) যথারীতি যুদ্ধের সময়ও এ আদেশ দিতেন যে, কোনো শিশু-বৃদ্ধ-নারী এবং ধর্মীয় পণ্ডিত-পুরোহিত যারা সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না–

তাদেরকে হত্যা করবে না। সুতরাং এ হলো মুহাম্মদ (সা.)-এর উত্তম আদর্শ এবং ইসলামের শিক্ষা।

এখন সারিয়্যা রাজী'র উল্লেখ করব। যেহেতু এর বিবরণ দীর্ঘ তাই কিয়দংশ আজ উপস্থাপন করব। এ সেনাভিযানের আমীর মারসাদ বিন আবি মারসাদ-এর নামানুসারে একে 'সারিয়্যা মারসাদ বিন আবি মারসাদ'-ও বলা হয়ে থাকে, কিন্তু অধিক প্রসিদ্ধ নাম হলো রাজী'র সেনাভিযান। রাজী বনু হুযায়েলের একটি ঝরনার নাম যা হিজাযে অবস্থিত। এর বর্তমান নাম বাতিয়া যা মক্কা থেকে সত্তর কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। এ সেনাভিযান ৪র্থ হিজরীর সূচনাতে রাজী'তে সংঘটিত হয়েছিল। ইবনে ইসহাক এবং ইবনে হিশাম-এর মতে এ সেনাভিযান উহুদের যুদ্ধের পর তৃতীয় বছরে সংঘটিত হয়েছিল। বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারী এবং মাওয়াহেব-এ লিপিবদ্ধ আছে, এটি তৃতীয় হিজরীর শেষের দিকে সংঘটিত হয়েছিল।

আমাদের রিসার্চ সেল সারিয়্যা রাজী'র বিষয়ে একটি নোট দিয়েছে। এই সেনাভিযান কখন কোন তারিখে সংঘটিত হয়েছে সে প্রেক্ষাপটে এটি মনোযোগের দাবি রাখে। যাহোক, যারা গবেষণা করেন তাদের জন্য এটি উপকারী হতে পারে, তাই আমি এটিও পড়ে দিচ্ছি।

ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থগুলোতে এমনকি বুখারীতেও রাজী এবং বে'রে মাউনা'র ঘটনাকে পরস্পর গুলিয়ে ফেলা হয়েছে আর কতক জীবনীকার এদিকে দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছেন। এতে এই ভুলটিও হয়েছে যে, অধিকাংশ জীবনীকার রাজী'র সেনাভিযানের তারিখ চতুর্থ হিজরীর সফর মাস উল্লেখ করেছেন। এর বিস্তারিত বিবরণ এভাবে দেয়া হয়েছে যে, হযরত খুবায়েব এবং হযরত যায়েদকে মক্কায় বিক্রি করে দেয়া হয়েছিল, কিন্তু নিষিদ্ধ মাস শুরু হওয়ার কারণে মক্কাবাসীরা তাদেরকে বন্দি করে রাখে এবং সম্মানিত মাস শেষ হওয়ার পর তাদের উভয়কে হত্যা করে। অধিকাংশ জীবনীকার এটিই বর্ণনা করেন, কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, নিষিদ্ধ মাস তো চারটি। তিনটি পর্যায়ক্রমে রয়েছে অর্থাৎ, যিলকদ, যিলহজ্জ এবং মুহাররম; আর মুহাররমের পাঁচ মাস পর চতুর্থ মাস রজব। এখন যেহেতু এই সারিয়্যা সফর মাসে সংঘটিত হয়েছিল তাই প্রথম তিন সম্মানিত মাস তো পূর্বেই অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। এখন সফরের চার মাস পর সম্মানিত চতুর্থ মাস আসার কথা। তাই যদি এ সারিয়্যা চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে হয়েছিল বলে মেনে নেয়া হয় তাহলে এটি বলা বিবেকসম্মত নয় যে, নিষিদ্ধ মাস শুরু হয়ে গিয়েছিল। একইভাবে যদি সম্মানিত মাস না-ই হয়ে থাকে তাহলে তাদের উভয়কে এতদিন বন্দি করে রাখার কোনো অর্থই হয় না। মক্কাবাসীরা তাদেরকে দ্রুততম সময়ে হত্যা করে নিজেদের প্রতিশোধের জ্বালা নিবারণ করতে চাচ্ছিল, তাই অযথা তাদেরকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বন্দি রাখার, পানাহার করানোর এবং তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়ার কী দরকার ছিল? যে সমস্ত জীবনীকার এবং ঐতিহাসিক এটিকে চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে সংঘটিত হয়েছে বলে বর্ণনা করেছেন, তারা এসব প্রশ্ন উত্থাপন করেন নি। আমাদের কাছে দুটি পথের মাঝে একটি রয়েছে আর তা হলো, হয়ত সম্মানিত মাস এবং তাদের দুজনের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বন্দি থাকার বিষয়টি সঠিক নয়; অথবা আমাদের বলতে হবে যে, এ সমস্ত রেওয়ায়েত সঠিক অর্থাৎ নিষিদ্ধ মাসও আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল এবং এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তারা বন্দিও ছিলেন। অবশ্য এ পরিস্থিতিতে এটিও মানতে হবে যে, অধিকাংশ ঐতিহাসিক এবং জীবনীকারের এ সারিয়্যার তারিখ সংরক্ষণে ভুল হয়েছে। আর এ শ্রেণীর ঐতিহাসিকের কথা অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় যারা বলে যে, যখন মক্কায় বিক্রি করা হয় তখন পবিত্র মাস অর্থাৎ যিলকদ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল; অবশ্য

তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। যেমন সীরাত ইবনে ইসহাক যা সবচেয়ে প্রাচীন জীবনীমূলক গ্রন্থের একটি এবং সীরাত ইবনে হিশাম– উভয়ে রাজী'র অভিযানের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন, উহুদের যুদ্ধের পর ৩য় হিজরীতে এ অভিযান সংঘটিত হয় এবং বুখারীর একজন বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য ভাষ্যকার ইবনে হাজর 'ফাতহুল বারী'-তে এ মর্মে বর্ণনা করেন, এ ঘটনা ৩য় হিজরীর শেষে সংঘটিত হয়। এ প্রেক্ষাপটে সীরাতের আরো একটি বই 'মাওয়াহেবুল লাদুন্নিয়া'-তেও লেখা আছে বিধায় এটিই সর্বাধিক সঠিক বলে মনে হয়, এ অভিযান ৩য় হিজরীর শাওয়াল মাসের শেষের দিনগুলোতে সংঘটিত হয়। আর ৪র্থ হিজরীর সফর মাসে যেহেতু হযরত খুবায়েব এবং হযরত যায়েদ (রা.)-কে শহীদ করা হয়েছিল এবং তাদের শাহাদতের সংবাদ যখন মদীনায় পৌঁছে তখন রেওয়ায়েতে এই তারিখগুলো ধীরে ধীরে স্থান করে নেয়। যাহোক, প্রকৃত বিষয় আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন।

এই অভিযানের প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে লেখা আছে, বিগত অভিযান তথা আব্দুল্লাহ্ বিন উনায়েসের অভিযানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বনু লিহইয়ান-এর সর্দার সুফিয়ান বিন খালিদকে হত্যা করা হয় যে–কারণে এই গোত্র প্রতিশোধের আগুনে জ্বলছিল আর রাতদিন মুসলমানদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার উপায় নিয়ে ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে থাকে। সুতরাং এই গোত্রের কিছু লোক আযল ও কারা গোত্রের নিকট আসে। এরা ভীষণ দক্ষ তিরন্দাজ ছিল। আযল বনু হাওন বিন খুযায়মা-র একটি শাখা যা আযল বিন দাইশ-এর প্রতি আরোপিত হতো। কারা গোত্রও হাওন-এর একটি শাখা ছিল যা দাইশ-এর প্রতি আরোপিত হতো। বনু লিহইয়ান তাদের বলল, তোমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে মদীনায় যাও এবং তাঁর নিকট তোমাদের গোত্রে ইসলামের তবলীগ ও বাণী প্রচারের নামে কিছু লোক তোমাদের সাথে পাঠানোর আবেদন জানাও। আর পুরো আশা করা যায়, মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের সাথে তাঁর কিছু লোক পাঠিয়ে দেবেন। মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবীরা তোমাদের সাথে আসলে আমরা তাদেরকে মক্কার লোকদের কাছে বিক্রি করে দেবো যার বিনিময়ে আমরা বিপুল অর্থ লাভ করব এবং মক্কাবাসীরা তাদের হত্যা করবে। এর ফলে আমাদের প্রতিশোধ-পিপাসারও নিবারণ হবে এবং এ ধনসম্পদ থেকে আমরা তোমাদেরকেও একটি অংশ দান করব। অতএব যথারীতি এ ষড়যন্ত্র করে আযল ও কারা গোত্রের সাত ব্যক্তির একটি দল মদীনায় আসে এবং মহানবী (সা.)-এর সমীপে বলে, আমাদের গোত্রে ইসলাম অনেক জনপ্রিয়, তাই আপনি আপনার কিছু লোক আমাদের সঙ্গে প্রেরণ করুন যারা সেখানে ইসলাম প্রচারের কাজ করবেন। সে দিনগুলোতে মহানবী (সা.) দশ ব্যক্তি সমন্বয়ে একটি দল প্রস্তুত করেছিলেন যাদের দায়িত্ব ছিল, মক্কার আশপাশে গোয়েন্দাগিরির মাধ্যমে অবস্থা পর্যালোচনা করা। আগত এই দলটি দেখে মহানবী (সা.) দশ ব্যক্তির এই দলকে তাদের সাথে প্রেরণ করেন। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহানবী (সা.) তাদের সাথে সাতজন ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছিলেন। ইবনে হিশাম লেখেন, তিনি (সা.) ছয়জন সাহাবী তাদের সাথে প্রেরণ করেছিলেন। পক্ষান্তরে ইবনে সা'দ বলেন, তারা দশজন ছিলেন এবং এর মাঝে সাতজনের নাম উল্লেখ করেন। সহীহ বুখারীতে দশজনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সীরাতের অধিকাংশ বইপুস্তকে দশজন সাহাবীর উল্লেখ রয়েছে, যদিও নাম কেবল সাতজনের পাওয়া যায়। মহানবী (সা.) হযরত আসিম বিন সাবিত (রা.)-কে আমীর নিযুক্ত করেন; আবার কেউ কেউ বলে, হযরত মারসাদ বিন আবি মারসাদ গানভী (রা.)-কে আমীর নিযুক্ত করেন।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন,

হিজরতের ৪র্থ বছর আরবের দুটি গোত্র আযল এবং কারা নিজেদের প্রতিনিধি দল মহানবী (সা.)-এর নিকট প্রেরণ করে নিবেদন জানান, আমাদের গোত্রের অনেক মানুষ ইসলামের প্রতি অনুরক্ত। (তারা) ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবগত (এমন) কয়েকজন ব্যক্তিকে প্রেরণ করার আর্জি জানিয়েছে যেন তারা তাদের মাঝে অবস্থান করে তাদেরকে এই নতুন ধর্মের শিক্ষা প্রদান করতে পারে। আসলে এটি একটি চক্রান্ত ছিল যা ইসলামের চরম শত্রু বনু লিহইয়ান করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, এই প্রতিনিধি দল মুসলমানদেরকে নিয়ে আসলে তাদেরকে (অর্থাৎ মুসলমনাদেরকে) হত্যা করে নিজেদের নেতা সুফিয়ান বিন খালিদের প্রতিশোধ নেবে। অতএব, তারা আযল এবং কারা (গোত্রের) প্রতিনিধি দলকে পুরস্কারের বড়ো বড়ো প্রতিশ্রুতি দিয়ে কতক মুসলমানকে সাথে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.)-এর সমীপে প্রেরণ করে। আযল ও কারা গোত্রের সদস্যরা মহানবী (সা.)-এর সমীপে পৌঁছে নিবেদন করলে তিনি (সা.) তাদের কথায় আস্থা রেখে দশজন মুসলমানকে তাদের সাথে প্রেরণ করেন যেন তারা তাদেরকে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস এবং রীতিনীতি সম্পর্কে শিক্ষা দেন।

অতঃপর তারা (তাদের সাথে) যান। পরবর্তীতে যে ঘটনাসমূহ রয়েছে তা ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করব।

আজকে আমি পুনরায় ইয়েমেনের কারাবন্দিদের জন্য বিশেষভাবে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি। বিশেষত সেই ভদ্রমহিলার জন্য যিনি সেখানকার লাজনার সদর। তাকে চরম কঠিন অবস্থায় কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। যারা তাদের সামনে নতি স্বীকার করতে প্রস্তুত নয় এমন আরো কয়েকজন সদস্যকেও কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। তাদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের মুক্তির উপায় সৃষ্টি করুন। পাকিস্তানের কারাবন্দিদের মুক্তির জন্যও দোয়া করুন।

ফিলিস্তিনের লোকদের জন্যও দোয়া অব্যাহত রাখুন। সেখানে পরিস্থিতি ভালো হতে হতে আবার অবনতির দিকে চলে যায়। ইসরাঈলী সরকার স্বেচ্ছাচারী আচরণ প্রদর্শন করছে। আল্লাহ্ তা'লা এদেরকে (অর্থাৎ ফিলিস্তিনীদেরকে) তাদের অত্যাচার-নিপীড়নের হাত থেকে অতিশীঘ্রই মুক্তি দান করুন এবং মুসলমানদেরকেও নিজেদের দায়িত্ব (যথাযথভাবে) পালন করার তৌফিক দান করুন।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)